উপনিবেশ : আমাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্মক্ষত

মনিরুল ইসলাম

ইতিহাসের জ্ঞান বলে উপনিবেশীকরণ একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রের স্বতঃস্ফূর্ততা বিধ্বস্ত করে দেয়, ব্যাহত করে তার স্বাভাবিক বিকাশ। বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থার মূলধারা এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা, উপনিবেশের মাধ্যমে আরোপিত অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের মতো এখানেও কীভাবে চিরস্থায়ী ক্ষত তৈরি হলো? এখানেও কি বন্ধাত্ব্য কিংবা খন্ডিত জগত তৈরি হয়েছে? সম্পদ এবং সম্ভাবনার কী আমরা হারিয়েছি? কীভাবে এর থেকে বের হওয়া সম্ভব? এদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থার ওপর উপনিবেশের নানাবিধ প্রভাব অনুসন্ধান চেষ্টাতেই এই প্রবন্ধ।

গল্পকার বনফুলের 'মানুষের মন' গল্পের দুই ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। একজন ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় বিশ্বাস করেন, অন্যজনের আস্থা পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসার ওপর। এই আস্থা বা বিশ্বাস যতটা জ্ঞাননির্ভর, তার চেয়েও বেশি মনের দুর্বলতা, সেটা বোঝা যায় গল্পের শেষে। আমাদের বর্তমান সমাজে বেশির ভাগ মানুষ এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসানির্ভর হয়ে গেছে। যারা এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা পাচ্ছে এবং যারা দিচ্ছে তাদের বেশির ভাগেরই ধারণা, 'এই উন্নত চিকিৎসা নিয়ে এসে ইংরেজ আমাদের উপকারই করেছে' কিংবা 'ওরা সময়মতো এটা নিয়ে না এলে আমাদের হয়তো অকালে মরতে হতো'। আমাদের এই ধারণাও ইতিহাসের জ্ঞাননির্ভর নয়। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে, যারা বাণিজ্য ও লুটপাটের জন্য এদেশের ক্ষমতা দখল করেছিল, এদেশের উপকারের কথা ভেবে তারা তেমন কিছু করেনি। ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের দেখিয়ে দেয়, উপনিবেশ একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রের স্বতঃস্ফূর্ততা বিধ্বস্ত করে দেয়, ব্যাহত করে এর স্বাভাবিক বিকাশ। আমরা যদি ব্রিটিশদের উপনিবেশ না-ও হতাম তা-ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা এদেশে আসত, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন মনোভাব হয়তো ততটা আহত ও বিকৃত হতো না। অতএব, যদিও আমাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থার মূলধারা এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা, উপনিবেশের মাধ্যমে আরোপিত অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের মতো এটাও আমাদের কতটা এগিয়ে নিয়েছে এবং সামাজিক ও মানসিকভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থার ওপর উপনিবেশের প্রভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই সংশয় নিয়েই ইতিহাস ও সমাজ-বাস্তবতার দিকে তাকাতে চাই।

চিকিৎসার বিদ্যাকে আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞান বা মেডিক্যাল সায়েন্স বলে ডাকা হয়। কিন্তু চিকিৎসা 'বিজ্ঞান' হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই, বলতে গেলে প্রাচীনকাল থেকেই একটি কলা বা আর্ট। কৃষি ও হস্তশিল্পের মতো চিকিৎসাও প্রাচীনকাল থেকেই একটি বৃত্তি। চর্চার মাধ্যমে কিছু লোক যখন ওই কাজে পারদর্শী হয়ে উঠল, তখন এটি হয়ে উঠেছে একটি বৃত্তি। এমনি করেই গড়ে উঠেছে কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতার–এমনি নানা বৃত্তির জনগোষ্ঠী। চিকিৎসাও প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের প্রতিটি জনপদে প্রচলিত হয় একটি আর্ট ও বৃত্তি হিসেবে। পাশ্চাত্যে যাকে বলে সারিয়ে তোলার আর্ট (art of healing)। মানুষের সংস্কৃতি ও চিন্তার একটি প্রবণতা হলো জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য অক্ষমতাকে কল্পনা দিয়ে পরিপূর্ণ করে তোলা। সে কারণেই একসময় চিকিৎসাবৃত্তিকে নির্ভর করতে হয়েছে 'জাদু' ও ধর্মের ওপর। বহু শতাব্দী ধরে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ফলে ধীরে ধীরে এই বৃত্তি হয়েছে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণনির্ভর। এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানই আজ চিকিৎসাবৃত্তির প্রধান বাহন। একসময় এ বৃত্তি ছিল সংস্কৃতি বা কালচারের অংশ। অন্য পাঁচটি বৃত্তির মতোই এর শিক্ষা ও চর্চা চলত বংশপরম্পরায়, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে পরিবেশগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে তা আয়ত্ত করার জন্য বিজ্ঞানের উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে বহু বছরের শিক্ষা এবং বাস্তব প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

মানুষের সংস্কৃতি ও চিন্তার একটি প্রবণতা হলো জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য অক্ষমতাকে কল্পনা দিয়ে পরিপূর্ণ করে তোলা। সে কারণেই একসময় চিকিৎসাবৃত্তিকে নির্ভর করতে হয়েছে 'জাদু' ও ধর্মের ওপর। বহু শতাব্দী ধরে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ফলে ধীরে ধীরে এই বৃত্তি হয়েছে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণনির্ভর। এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানই আজ চিকিৎসাবৃত্তির প্রধান বাহন।

কৃষিসহ অন্য অনেক বৃত্তিই এখন কমবেশি বিজ্ঞাননির্ভর হয়ে গেছে। তারপরও কৃষিজীবী হবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা সামাজিক স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক কিছু নয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবৃত্তির চর্চাকারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি (রেজিস্ট্রেশন) বাধ্যতামূলক। এ যুগের অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানেই। চিকিৎসাবৃত্তির ওপর এই নিয়ন্ত্রণ খুব বেশিদিনের নয়। সতেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি ঘটে, তার সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার সমন্বয়ের ফলে এই ক্ষেত্রের তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটতে থাকে। এর ফলে পাশ্চাত্যে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চায় যুক্ত হয় অনেক নতুন ধরনের ওষুধ ও শল্যচিকিৎসা। এর ধারাবাহিকতায় পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদ্যা এমন একটি পর্যায়ে চলে আসে যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ ছাড়া এর চর্চা করা যথার্থ ও নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়নি। ১৮৫৮ সালে ব্রিটেনে মেডিক্যাল অ্যাক্টের আওতায় চিকিৎসকদের 'রেজিস্ট্রেশন' বাধ্যতামূলক করা হয়। পাশ্চাত্যেও 'আধুনিক' চিকিৎসার ওষুধ, শল্যচিকিৎসা ও অন্যান্য পদ্ধতির জটিলতা এবং ব্যবহৃত ওষুধ ও পদ্ধতি থেকে সাম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকির কারণেই এর চর্চাকে সীমাবদ্ধতা ও অধিক জবাবদিহির মধ্যে আনা হয়েছে। অন্যদিকে রোগের চিকিৎসা, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ নির্মূল করার (eradication) অর্জিত ক্ষমতার কারণে চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের শরীর ও সুস্থতার ব্যাপারে (মতামত ও ধারণা দেবার ক্ষেত্রে) একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছে। মূলত সে কারণেই (বিশেষত

পাশ্চাত্যে) আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক হয়েছে অবিচ্ছেদ্য।[১] এর থেকে আন্দাজ করা যায় যে, একটি স্বাধীন বৃত্তি হিসেবে শুরু হলেও আধুনিক সমাজে চিকিৎসা অন্য অনেক বৃত্তির চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র ও সমাজের চরিত্রের পরিবর্তন এরকম একটি বৃত্তিকে অন্য যেকোনো বৃত্তি থেকে অনেক বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করে। এছাড়া ওপর থেকে আরোপ করা কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে শারীরিক সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি এখানে কিছুটা উপেক্ষিত হতে থাকে।

প্রাচীনকাল থেকেই সকল জনপদ ও সভ্যতায় এই art of healing প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধরন অনুযায়ী চালু ছিল। আজকের যুগে, গত দুই শ বছর ধরে পাশ্চাত্যে গড়ে ওঠা 'আধুনিক' চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়া বাকি সব ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি হয়ে গেছে 'বিকল্প ধারার চিকিৎসা' বা Alternative Medicine। বিকল্প ধারার চিকিৎসা মূলধারা থেকে অনেক দূরের। এগুলো এক যুগের সারিয়ে তোলার প্রতিষ্ঠিত আর্ট হলেও 'আধুনিক' চিকিৎসাবিজ্ঞানের তারা আর কেউ নয়। কারণ 'অল্টারনেটিভ' মেডিসিনের সংজ্ঞা হলো, "চিকিৎসার এমন পদ্ধতি, যার রোগ সারানোতে ভূমিকা আছে কিন্তু এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিজাত তথ্য-প্রমাণ থেকে গড়ে ওঠেনি (Alternative medicine is any practice that is put forward as having the healing effects of medicine, but does not originate from evidence gathered using the scientific method, is not part of biomedicine, or is contradicted by scientific evidence or established science.)[২,৩]। এর বিপরীতে পাশ্চাত্যের 'আধুনিক' চিকিৎসাবিদ্যাকে ডাকা হচ্ছে জৈববিজ্ঞান-ভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা বা Bio-medicine নামে। জৈববিজ্ঞান-ভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যার সংজ্ঞা হলো, চিকিৎসাবিদ্যার যে শাখা ক্লিনিক্যাল চিকিৎসার ক্ষেত্রে জীবজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নীতি ও সূত্রগুলোর প্রয়োগ করে (Biomedicine is a branch of medical science that applies biological and other natural-science principles to clinical practice)[৪]। 'আধুনিক' চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার ফলে সকল জনপদের ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি অর্থাৎ একসময়ের গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি কী করে প্রতিটি জনপদের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে অপর বা বিকল্প ধারার একটি বিষয় হয়ে গেল, এটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছে কি না এবং এই বিচ্যুতির ক্ষেত্রে উপনিবেশের ভূমিকা কতটুকু–প্রশ্নগুলো আমাদের বর্তমান আলোচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরোপে এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে আঠারো শতক থেকে। পুঁজিবাদের বিকাশ ও শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল, তার ফলে চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক যুগান্তকারী নতুন ধারণার জন্ম বা উদ্ভব ঘটে, যা রোগের ব্যাখ্যা ও চিকিৎসাধারার ক্ষেত্রে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণরসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রোগতত্ত্ব (Pathology), অণুজীববিদ্যা (Microbiology), পরজীবীবিদ্যা (Parasitology) ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপক উন্নতির ফলে পাশ্চাত্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারণা ও চর্চার জায়গাটি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নীতি ও সূত্রগুলোর প্রয়োগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসার মূলধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও চর্চা উভয় দিক থেকেই এই পদ্ধতি প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যগত ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং দূরে সরে যেতে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রবল স্রোতের মুখে প্রথমে পাশ্চাত্যে এবং পরে প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো পরাজিত ও দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদায় 'অল্টারনেটিভ মেডিসিন' বা 'অপর চিকিৎসায়' পরিণত হয়েছে। প্রচলিত চিকিৎসার এই পরিণতি সব দেশে এক রকম নয়। পাশ্চাত্য এবং উপনিবেশিত হয়নি প্রাচ্যের এমন দেশগুলোর চেয়ে উপনিবেশিত দেশগুলোতে ঐতিহ্যগত চিকিৎসার পরিণতি অপেক্ষাকৃত করুণ।

উপনিবেশোত্তর অনুসন্ধানে (postcolonial studies) উপনিবেশিত দেশগুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘমেয়াদি আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রভাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানে যেসব প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজতে চেষ্টা করছি তা এ ধরনের অনুসন্ধানের খুব কাছাকাছি।

প্রাচীনকাল থেকেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সভ্যতায় উন্নত জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির ধারা বজায় ছিল। চিকিৎসার প্রধান দিক হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক। জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে চিকিৎসাবিদ্যা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের শরীর, রোগ ও শারীরিক সমস্যা এবং এর প্রতিকার-প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান করেছে। এই অনুসন্ধান ও চর্চার ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একই গতিতে চলেছে। এই সময় পর্যন্ত পারস্যের বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনার চিকিৎসা বিষয়ক বই 'কানুন' ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অতীতে প্রাচ্যের চিকিৎসাবিদ্যা অনেক সময় ছিল পাশ্চাত্য থেকে অগ্রসর এবং অনেক সময়ে ছিল পাশ্চাত্যের সমান্তরাল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে রেনেসাঁ, শিল্প বিপ্লব, জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব, এসব কারণে ইউরোপে জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির গতি বহুগুণ বেড়ে যায় এবং এর প্রকাশও হতে থাকে বহুমুখী। এ সময় ইউরোপে বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চা অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠায় আগের চেয়ে অনেক সংগঠিত পর্যায়ে চলে যায়। অন্যান্য বিদ্যার মতো চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটতে থাকে। অন্যান্য সভ্যতার উন্নত ও মুক্তচিন্তার মানুষের পক্ষে জ্ঞান ও উপলব্ধির এই ধারাকে অগ্রাহ্য করা বা গ্রহণ না করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তবে এই গ্রহণ হওয়া উচিত তাদের মুক্ত পছন্দের ব্যাপার, চাপিয়ে দেওয়া কিছু নয়।

অনুসন্ধান ও চর্চার ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একই গতিতে চলেছে। এই সময় পর্যন্ত পারস্যের বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনার চিকিৎসা বিষয়ক বই 'কানুন' ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসকরা কি এদেশে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়েছে, নাকি এর আগমন অনিবার্য ছিল? পৃথিবীর গত কয়েক শ বছরের ইতিহাসে পাশ্চাত্যের দেশগুলোই উপনিবেশকারী এবং ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশ ছিল উপনিবেশিত। উপনিবেশিত এইসব দেশে পাশ্চাত্যের 'আধুনিক' চিকিৎসা এসেছে পশ্চিমা উপনিবেশকারীদের মাধ্যমে। মূলত সে কারণেই প্রশ্ন আসে, উপনিবেশকারীরা প্রাচ্যের দেশগুলোতে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়েছে কি না? উপনিবেশিত হয়নি এমন অনেক দেশও উনিশ শতক থেকে

চিকিৎসার মূলধারা হিসেবে ধীরে ধীরে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যেমন–জাপান। বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিমের জন্য 'দরজা বন্ধ করে' রাখলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তারা 'বায়ো-মেডিসিন' বা আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি দ্রুত গ্রহণ করতে থাকে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে জাপানে এটি চিকিৎসার মূল পদ্ধতি হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। চীন উপনিবেশিত না হলেও পশ্চিমা ব্যবসায়ী ও খ্রিস্টান মিশনারিরা অষ্টাদশ শতক থেকেই চীনে ব্যাপকভাবে ছিল। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই এরা (পশ্চিমারা) নানাভাবে চীনে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসা চালু করার চেষ্টা করে। কিন্তু যে বিষয়টি খুব লক্ষণীয় তা হলো এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চীনের লোকেরা পশ্চিমা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবার আগ পর্যন্ত পশ্চিমা চিকিৎসা-ব্যবস্থা চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চীনের আধুনিকতার পথিকৃৎ ও 'প্রথম বিপ্লবের' নেতা সান ইয়াতসেন (Sun Yatsen) ছিলেন হংকং মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম গ্র্যাজুয়েটদের একজন, এখানে তিনি ব্রিটেনের বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার জেমস ক্যান্টিলির ছাত্র ছিলেন। এসময় চীনের আধুনিকতাকামীরা পশ্চিমা আধুনিক জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য জাপান ও ইংল্যান্ডে পড়তে যেত। সান নিজেও ওই কাতারে ছিলেন। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক লু সুনও (Lu Xun) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ থেকেই জাপানে গিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।[৫]

উপনিবেশিত ভারতে চিত্রটি একটু ভিন্ন, এখানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা এসেছে উপনিবেশকারীদের ইচ্ছানুযায়ী; এদেশের মানুষের স্বাধীন পছন্দের মাধ্যমে নয়। একটি স্বাধীন দেশ নিজেদের পছন্দে জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত একটি ধারাকে গ্রহণ করা এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে তা আসার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। জর্জ বাসালা দেখিয়েছেন, শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের সকল শাখার ক্ষেত্রেই উপনিবেশকারীদের মাধ্যমে প্রচলিত হওয়া বিজ্ঞান স্বাধীন সত্তা হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। 'নিম্নস্তরের' (inferior) না হলেও এক ধরনের 'নির্ভরশীল' (dependent) বিজ্ঞানে পরিণত হয়।[৬] ১৮৪৯ সালে ইউরোপীয়রা যাওয়ার আগে চীনা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতিই ছিল জাপানের মূল চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৮৫৩ সালে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হবার পর দ্রুতগতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার কারণে জাপানি চিকিৎসকগণ অল্প সময়ের মধ্যেই এটা আয়ত্ত করে নেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা আধুনিক চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করেন। ...তাঁরা প্লেগ, রক্ত আমাশয় ও নিউরোসিফিলিসের জীবাণু (plague, dysentery, bacilli) আবিষ্কার এবং টিটেনাসের জন্য সেরাম চিকিৎসা (serum therapy) ও সিফিলিসের চিকিৎসা উদ্ভাবন করেন।[৭] জাপান ও চীনে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশ্চাত্য থেকে গেলেও তা যে 'নির্ভরশীল' (dependent) বিজ্ঞানে পরিণত হয়নি, তার প্রমাণ হলো স্বাধীনভাবে এই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে একে পরিবর্তন, পরিমার্জন করে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা। জাপান ও চীনের অনেক আগেই উপনিবেশিত ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করার পর জাপান ও চীন যত অল্প সময়ের মধ্যে একে আয়ত্ত করে নেয়, এই উপমহাদেশসহ অন্যান্য উপনিবেশিত দেশ একই গতিতে তা করতে পারেনি।

আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভবের ফলে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যগত ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর বেশির ভাগ ধারণা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তবে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর অনেক ধারণাই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে আত্মীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির এমন সব অংশ বাদ দিয়ে গ্রহণযোগ্য অংশগুলোকে আত্মীকৃত করা হয়। ফলে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে অতীতের চিন্তাবিদ ও চর্চাকারীদের গুরুত্ব খুব বেশি খাটো হয়নি। প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা উনিশ শতকে যখন প্রথম এদেশে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন তৎকালীন হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের পাশাপাশি এদেশীয় আয়ুর্বেদ ও ইউনানি শাস্ত্রও পড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে এদেশের ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি বাদ দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুধু পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর জন্য কলকাতা ও মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ চালু করা হয়।[৮] এভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার প্রবেশ শিক্ষার মূলধারা থেকে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়; যার ফলে এর সঙ্গে কোনো ধরনের সমন্বয় বা আত্মীকরণ ঘটার সম্ভবনাও অনেক কমে যায়। ক্রমে ক্রমে এদের ওপর 'অল্টারনেটিভ মেডিসিন' বা 'অপর চিকিৎসা'র লেবেল পরে যাওয়ায় এর গ্রহণীয় অংশ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয় আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা। এর ফলে জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে, (সুদূর অতীত কাল থেকে) 'আর্ট অব হিলিং'-এর ক্ষেত্রে উপমহাদেশের মানুষের চিন্তা ও কর্মগত অবদানকে অস্বীকার করা এবং ভুলে যাওয়ার পথ উন্মোচিত হয়।

তৎকালীন হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের পাশাপাশি এদেশীয় আয়ুর্বেদ ও ইউনানি শাস্ত্রও পড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে এদেশের ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি বাদ দেওয়া হয়।

১৮৮০-এর দশক উপনিবেশিত ভারতের জন্য অনেক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ১২৫ বছর উপনিবেশিত থাকার পর, এই সময়ে এদেশের জনগণের ক্ষুদ্র এক অংশের মধ্যে আত্মোপলব্ধির নতুন পর্যায় আসে। এ সময়টি শুধু রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ারই সূচনা নয়, ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাবোধ ও ঐতিহ্যপ্রীতিও এসময় নতুন মাত্রায় জেগে ওঠে। অন্য অনেক কিছুর পাশাপাশি ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এর মর্যাদা ফিরিয়ে আনা এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে এর সমন্বয় করা–এই তিন ধরনের প্রচেষ্টাই শুরু হয় এসময়। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকা এই 'পুনরুজ্জীবন আন্দোলন' (revival movement) হয়তো খুব পরিণত কিছু ছিল না। এর সফলতার ভাগও খুব বেশি কিছু নয়। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং কিছুটা উন্নত 'অল্টারনেটিভ মেডিসিনে' পরিণত করা, প্রচলিত পদ্ধতির চিকিৎসকদের জন্য কিছুটা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায় ইত্যাদি। সমন্বয় করার প্রচেষ্টা বলতে গেলে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে, এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও প্রাজ্ঞ উপলব্ধির অভাবে। এই ব্যর্থতার পেছনে প্রত্যক্ষে (রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে) ও পরোক্ষে (জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে) উপনিবেশের ভূমিকা ছিল।

প্রতিটি উপনিবেশেই উপনিবেশকারীরা তাদের প্রবর্তিত

শাসনপদ্ধতি, আইনকানুন, নিয়মনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও চিন্তাগত অধীনতা ও আনুগত্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছে। উনিশ শতকে এই উপমহাদেশে উপনিবেশকারী ব্রিটিশদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পাশ্চাত্যের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে খুব ব্যাপক ও সংগঠিতভাবে চিন্তাগত অধীনতা ও আনুগত্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে তার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৮] পশ্চিমা খ্রিস্টান মিশনারিগুলো এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। তারা উনিশ শতক থেকেই পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে চিকিৎসাসেবা দিয়ে এদেশের মানুষের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম ও পাশ্চাত্যের প্রতি এক ধরনের আনুগত্যবোধ ও নির্ভরতা তৈরি করতে চেয়েছিল। অবশ্য তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার, উপনিবেশকারীদের মতো সম্পদ লুণ্ঠন করা এবং বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করা নয়। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে যেভাবে এদেশে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসার মূলধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে এদেশে বিভিন্নভাবে তাদের প্রতি চিন্তাগত অধীনতা ও আনুগত্যবোধ তৈরি করেছে এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর এর প্রভাব কমেনি, বরং আরও বেড়েছে।

(২)

গাঙ্গেয় বদ্বীপভূমি এই বঙ্গদেশে উর্বর ভূমির কারণে অপেক্ষাকৃত ঘনবসতি ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। এ অঞ্চলে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের জীবনে অভাব থাকলেও আঠারো শতকের আগে তা প্রকট আকার ধারণ করেনি। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই এদেশে সাধারণ মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এর মধ্যে প্রথম ও করুণতম এক অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। অনাহার ও অপুষ্টিতে এত বিপুল মৃত্যু ও ব্যাপকসংখ্যক মানুষের অসুস্থতাজনিত অক্ষমতা ছিল এ অঞ্চলের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। রোগজীবাণু, জনস্বাস্থ্য ও জীবাণুনাশক সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞানের উদ্ভবের আগে ব্যক্তিগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই ছিল জীবাণুঘটিত রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র ভরসা, যার জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত পুষ্টির। জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর বাংলাদেশে ব্যাপক অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার ও পুষ্টির মান এত নিচে নেমে গিয়েছিল যে সংক্রামক রোগজনিত ব্যাপক হারে মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড ইত্যাদি সংক্রামক রোগের মহামারীতে বাংলাদেশেই (Bengal) মৃত্যুর সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শিশুমৃত্যু এবং সন্তান জন্মদানজনিত জটিলতায় মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল ব্যাপক। এরকম একটি পরিস্থিতিতে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক শাসকরা এদেশে প্রথম পাশ্চাত্য ধারার আধুনিক চিকিৎসা চালু করে।

> রাধিকা রামাসুবানের মতে, ১৯০০ সাল পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও এ উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না।

১৭৬৪ সালে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস (আইএমএস) নামক যে স্বাস্থ্যসেবা চালু হয়, সেটা ছিল মূলত এদেশে অবস্থানরত ইউরোপীয়দের জন্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা সেসব ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসেবা চালু করেছিল, যেসব বিষয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে বলে তারা মনে করত। জনস্বাস্থ্যগত যেসব পদক্ষেপ তারা নিয়েছিল সেগুলো ছিল ছড়ানো-ছিটানো এবং একে এমন প্রক্রিয়ায় সংগঠিত ও পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল, যাতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আহত সৈন্যদের চিকিৎসা এবং ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী ঠিকমতো চিকিৎসা পায়।[৭] এদেশীয়দের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি গুরুত্ব পেয়েছে কেবল তখনই, যখন তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপনিবেশ স্থাপনকারীদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় অথবা যদি তা তাদের মুনাফাকে প্রভাবিত করে। যেমন–কোনো তীর্থ বা ধর্মীয় পরবে অসংখ্য মানুষ একই স্থানে মিলিত হতো বলে এসব স্থানে রোগ ছড়িয়ে মহামারী হলে সেটা তাদের মুনাফার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে–এমন বিবেচনায় এসব স্থানে জনস্বাস্থ্যগত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হতো। অর্থাৎ তাদের প্রবর্তিত স্বাস্থ্যসেবার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতকে ইউরোপীয়দের জন্য বাসযোগ্য করা; এদেশীয়দের জন্য নয়।

এদেশে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন এবং একে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে অনেক উন্নত বলে প্রচার করাও ঔপনিবেশিক শাসকদের পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল। যদিও তাদের ওই 'আধুনিক' চিকিৎসা বরাবরই (দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল হবার কারণে) এদেশের সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরেই ছিল। সরকার কেবল পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতিকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকায় কিছুদিনের মধ্যেই এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতিই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি। দেশীয় চিকিৎসার ধারাটি এর ফলে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮২৭ সালে জন টেলর নামক এক ওরিয়েন্টালিস্টের উদ্যোগে কলকাতার হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় পশ্চিমা চিকিৎসাবিদ্যার পাশাপাশি দেশীয় আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানি পদ্ধতি সম্পর্কে পড়ানো শুরু হয়েছিল। এসময় পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু বই এদেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩৩ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের সরকার ডা. জন গ্রান্টকে প্রধান করে একটি কমিটি করে, যে কমিটি যাচাই করে দেশীয় পদ্ধতি পাঠ্যক্রমে থাকা উচিত কি না। এই কমিটি টেলর কমিটির বিপরীত মত দেয়। ১৮৩৪ সালের ২০ অক্টোবর তাদের রিপোর্ট পেশের চার মাসের মধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানোর জন্য কলকাতা ও মাদ্রাজে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৬] পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির চর্চা ও বিকাশের সম্ভবনাগুলো রুদ্ধ করে দিতে থাকে এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, অন্যান্য বিষয়ের মতো চিকিৎসার জন্যও পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি করা ছিল শাসকদের ঔপনিবেশিক স্বার্থেরই একটি অংশ।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা প্রকৃতপক্ষে যেভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পরিপূর্ণ সরকারি চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করেছিল, তার সুদূরপ্রসারী কুফল এখনো প্রতিনিয়ত আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে পদে পদে বিপর্যস্ত করছে। ব্রিটিশ ভারতের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার কাঠামো ছিল কঠোরভাবে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের একটি অংশ। প্রথমে সামরিক বাহিনীতে চিকিৎসা বিভাগ খুলে তাতে চিকিৎসকদের নিয়োগ দেওয়া হয়, পরে বেসামরিক চিকিৎসা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনদের (বেসামরিক চিকিৎসক) নিয়োগ দেওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি এই চিকিৎসকদের মূল কাজ ছিল ব্রিটিশ ও সাদা চামড়ার লোকদের এবং তাদের উচ্চ শ্রেণির দেশীয় সেবকদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া। উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে এদেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার অবস্থা যেমন ছিল তাতে বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত পশ্চিমা আধুনিক চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব ছিল না। রাধিকা

রামাসুবানের মতে, ১৯০০ সাল পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও এ উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না।[৭]

সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ম্যারিয়ট উপনিবেশোত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশে ১৯৫৫ সালে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান, অধিকাংশ সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিকিৎসা নিতে পারছে না। না পারার মূল কারণ দারিদ্র্য। তিনি দেখতে পান, সাধারণ মানুষের জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসার সীমিত উপস্থিতি নির্ভর করে সরকারি বা বিদেশি আর্থিক সাহায্যের ওপর।[৮] তৎকালীন পূর্ববাংলায়ও পরিস্থিতি এর চেয়ে খুব ভিন্ন কিছু ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ সরকার গ্রামাঞ্চলে সীমিতসংখ্যক 'ডিসপেনসারি' তৈরি করলেও হাসপাতাল ছিল হাতে গোনা, যার প্রায় সবই শহর অঞ্চলে। সে সময় গ্রামে থাকা শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের পক্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতির ডাক্তার ও ওষুধ সংগ্রহ করা ছিল খুবই কঠিন একটি ব্যাপার। স্বাভাবিক কারণেই দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল ছিল সে সময়ের ব্যাপক অধিকাংশ মানুষ। ১৯৬০-এর দশকের আগে এ অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

জাপান ও চীনের অবস্থা কিন্তু উপনিবেশিত ভারতের চেয়ে ভিন্ন ছিল। আমাদের এখানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্রিটিশ ও তাদের সেবকদের ইচ্ছায় এবং তাদের স্বার্থে যতটা প্রবর্তিত হয়েছে, সার্বিকভাবে জনগণের স্বার্থে ততটা নয়। তাই উনিশ ও বিশ শতকে পাশ্চাত্য চিকিৎসার সবচেয়ে ইতিবাচক আবিষ্কার, যেমন–জনস্বাস্থ্য, প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ) ইত্যাদি আমাদের দেশে অনেক পরে এসেছে। অন্যদিকে চীন নিজেদের পছন্দে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে বলে তারা পাশ্চাত্য চিকিৎসার এই অংশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। বলতে গেলে জনস্বাস্থ্য এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ শতকের প্রথম দিকে 'চীন জয়' করে নেয়। ১৯১১ সালে মাঞ্চুরিয়ায় প্লেগ মহামারী নিয়ন্ত্রণে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির অভাবনীয় সাফল্যের পর এসময় প্লেগ, কলেরা, জলাতঙ্ক, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের নিজস্ব টিকা উদ্ভাবন করে চীনের পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিকিৎসকরা। পাশ্চাত্য পদ্ধতির জনস্বাস্থ্য, প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় চীনা চিকিৎসকরা এতটাই পরিণত ও উন্নত অবস্থায় গিয়েছিলেন যে ১৯১১ সালে চীনে আন্তর্জাতিক প্লেগ সম্মেলন আয়োজিত হয়।[৫]

> এদেশীয় সবকিছুকে 'পশ্চাৎপদ', 'অচল' কিংবা 'অযৌক্তিক' বলে দেখানো এবং এগুলো সম্পর্কে জানতে বিমুখ হওয়া ইত্যাদি ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে তৈরি হওয়া প্রবণতা।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশ শতকের প্রথমার্ধে দারিদ্র্য ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে থাকলেও জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে এটি ব্রিটিশ ভারতে চিকিৎসার মূলধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শারীরিক অসুস্থতায় অধিকাংশ মানুষের 'গতি' হলেও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি হয়ে যায় দ্বিতীয় শ্রেণির বা অপর চিকিৎসা, পাশ্চাত্য চিকিৎসা যে গ্রহণ করতে পারছে না সেই 'উপায়হীনের' হীনতর একটি বিকল্প উপায়। এরকম পরিস্থিতিতে মেধাবী তরুণরা আর দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অধ্যয়ন ও চর্চার দিকে যাবে না। তা ঘটাই স্বাভাবিক। বংশানুক্রমে যাদের এই পেশা ছিল, সেইসব পরিবারের নতুন প্রজন্মের অনেকেই আর পৈতৃক পেশায় যেতে রাজি থাকেনি। ঔপনিবেশিক আধুনিক শিক্ষা দেশীয় ঐতিহ্য থেকে এই প্রজন্মের বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে এই পদ্ধতির চর্চায় পেশাদারত্ব ও সৃজনশীলতা কমতে থাকে এবং এগুলোর উন্নতির পথও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসকদের কায়দায় ঢালাওভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রবর্তন না করে পাশাপাশি এদেশের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে উন্নত ও আধুনিক করা সম্ভব হলে তা এদেশের মানুষের জন্য অনেকটাই মঙ্গলজনক হতো। কারণ এই চিকিৎসা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য, কম ব্যয়বহুল এবং এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই পদ্ধতির অধিকাংশ চিকিৎসা উপকরণ দেশীয় বা আঞ্চলিক উৎস থেকে পাওয়া যেত। ঔপনিবেশিক কায়দায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রবর্তনের ফলে উচ্চপর্যায়ের বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আধুনিক মানসিকতার ব্যক্তিদের মধ্যে এ বিদ্যার চর্চা কমতে থাকে। ফলে আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে এর সংযোগ ও সমন্বয়ের সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে কমে আসতে থাকে। পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিস্তার বিষয়টিকে আরও ত্বরান্বিত ও ব্যাপক করে তোলে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা কমে আসায় ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা বা নিরীক্ষার সুযোগ ও সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এরকম একটি অবস্থায় এ চিকিৎসা পদ্ধতির একটি সর্বজনীন মান (Universal Standard) বজায় রাখাও উত্তরোত্তর দুরূহ হয়ে উঠতে থাকে। ফলে হাতুড়ে চিকিৎসা, কুসংস্কার, অপচিকিৎসা–এরকম বহু নেতিবাচক উপাদানে কলুষিত হয়ে পড়ে হাজার বছর ধরে প্রচলিত এদেশের ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি।

(৩)

১৮৮৫ সালের পর থেকে উপনিবেশিত ভারতে এদেশীয়দের আত্মপরিচয় আত্মোপলব্ধির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এসময় উপনিবেশিত ভারতের অগ্রসর মানুষদের অনেকেই স্বাধিকার অর্জন এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির কথা ভাবতে থাকে। এসময়ই জন্ম হয় ভারতীয় কংগ্রেসের। এরই সমান্তরালে জেগে ওঠে নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও ভালোবাসা। এরই ধারায় ঐতিহ্যগত চিকিৎসার প্রতিও মনোযোগ দেন অনেকে। দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির 'পুনর্জাগরণের' এক নতুন প্রচেষ্টা (Ayurvedic Revival Movement) শুরু হয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলনকে যদি লক্ষ করি তাহলে আমরা দেখব, এর সুস্পষ্ট তিনটি ধারা ছিল। এর মধ্যে একটি ধারা ছিল বিশুদ্ধবাদী (Purist), যারা প্রাচীন ও প্রচলিত আয়ুর্বেদকে হুবহু ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় ধারাটি ছিল সমন্বয়বাদী (Syncreticists), এই ধারাটি পশ্চিমা চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে ঐতিহ্যগত চিকিৎসার এক ধরনের সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে আধুনিকতাবাদীরা (Modernist) ঐতিহ্যগত চিকিৎসার বিশেষ কোনো উপযোগিতা দেখতে পায়নি এবং এই পদ্ধতির বদলে পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল।

শেষোক্ত ধারার ব্যক্তিদের মধ্যে আধুনিকতার চেয়ে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবই বেশি ছিল। কারণ আধুনিক চিকিৎসা ঐতিহ্যগত চিকিৎসা থেকে উন্নত হতে পারে, কিন্তু ঐতিহ্যগত চিকিৎসা থেকে কোনো কিছুই নেবার নেই–এরকম চিন্তাও আধুনিক নয়। ১৯২৭ সালে মুম্বাইয়ের সার্জন জেনারেলের একটি রিপোর্টে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্পর্কে বলা হয়, "*যেকোনো প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির দিকে ফিরে যাওয়া হবে খুবই পশ্চাৎপদ একটি পদক্ষেপ। এগুলো বৈজ্ঞানিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এটি আধুনিক*

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত (Outclassed) হয়েছে।" একইভাবে ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাব্লিউ ডি সাদারল্যান্ড ঐতিহ্যগত চিকিৎসা বন্ধ করার পক্ষে মত দেন; কারণ তাঁদের মতে, এই 'অচল জঞ্জাল' (Obsolete absurdity) কোনো ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করতে পারে না।[১১] ঐতিহ্যগত চিকিৎসা সম্পর্কে সে সময়ের 'আধুনিকতাবাদীরা' মোটামুটি এরকম মনোভাবই পোষণ করতেন। তাঁদের এ ধরনের ধারণার পেছনে ঐতিহ্যগত এইসব পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের চিকিৎসার প্রায়োগিক মূল্যকে উপলব্ধি করার ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী। এদেশীয় সবকিছুকে 'পশ্চাৎপদ', 'অচল' কিংবা 'অযৌক্তিক' বলে দেখানো এবং এগুলো সম্পর্কে জানতে বিমুখ হওয়া ইত্যাদি ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে তৈরি হওয়া প্রবণতা।

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার প্রথমোক্ত ধারাটিও ছিল চরম মতাবলম্বী। এদের বেশির ভাগই চিকিৎসার জন্য পরিপূর্ণভাবে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে ফিরে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই ধারার পূর্বসূরি ছিলেন আঠারো ও উনিশ শতকের ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদী (Orientalist) উইলিয়াম জোন্স, হেনরি থমাস প্রমুখ। তাঁরা সংস্কৃত ভাষা থেকে বেদের 'স্বর্ণযুগের' প্রাচীন অনেক বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। প্রাচ্যবাদীদের কাজ 'বিশুদ্ধ' পুনর্জাগরণবাদীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে এদের উদ্যোগেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বেশ কিছু প্রাচীন বই সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এরা (বিশুদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী) ছিল অতীতচারী এবং চিকিৎসাবিদ্যার সমসাময়িক বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। অতীতে আর্য সভ্যতায় শিল্প-বাণিজ্য ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, ধর্ম ইত্যাদি মানবিক বৃত্তির উন্নত চর্চা হয়েছে। সে কারণেই তাঁরা বিশ্বাস করতে থাকেন, আর্যরা 'শ্রেষ্ঠ জাতি', আর্য সভ্যতা 'শ্রেষ্ঠ সভ্যতা', 'আদর্শ সভ্যতা'। অতএব, আর্য সভ্যতার স্বর্ণযুগে জন্ম নেওয়া এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে তাঁরা এ যুগেও শ্রেষ্ঠ, পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বা সমকক্ষ বিকল্প হিসেবে দেখতে থাকেন। এই প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্সের সূচনা হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব (antiquity) প্রমাণের চেষ্টার মাধ্যমে। প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে সমসাময়িক আত্মপরিচয়ের সংকট ও নব্য জাতীয়তাবাদী চেতনাকে মেলাতে গিয়ে এঁরা অদ্ভুত এক অবস্থানে এসে দাঁড়ান।

বাংলার আয়ুর্বেদ পুনর্জাগরণবাদীদের নেতা ম ম জ্ঞাননাথ সেন যুক্তি দেন, *"আয়ুর্বেদ প্রগতিশীল (progressive) নয়–এই অভিযোগ যতটা না আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে, তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের বিরুদ্ধে" (অর্থাৎ বিদ্বেষপ্রসূত)। আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তি হিসেবে তিনি এর প্রাচীনত্বকে নিয়ে আসেন, "যখন পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে, তখন ভারতীয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রথম অনুধাবন করেন চিকিৎসকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে (মানুষের দেহ) ব্যবচ্ছেদের গুরুত্ব।"*[১২] কিন্তু একই সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রগতিশীলতা ও প্রাচীনত্বের এই যুক্তি শেষ বিচারে ছিল স্ববিরোধী এবং আধুনিকতাবিরোধীও। এ ধরনের 'যুক্তি' দিয়ে আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশুদ্ধবাদীরা তাঁদের মধ্যে (আধুনিকতা ও প্রাচীনত্বের) যে স্ববিরোধিতাকে মূর্ত করে তোলেন তা প্রকারান্তরে তাঁদের বিরোধীদেরই পক্ষে যায়।[১৩] আয়ুর্বেদ পুনর্জাগরণ-প্রচেষ্টার এই বিশুদ্ধবাদী ধারাটি আয়ুর্বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তেমন সফল না হলেও এই আন্দোলনের ধারাটি ছিল এদেশের ঐতিহ্যের প্রতি উপনিবেশকারীদের অমর্যাদার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের গৌরবকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার এই প্রচেষ্টা এদেশের মানুষকে 'ইতিহাসবিহীন জনগোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত করার ব্রিটিশ ডিসকোর্সের কার্যকর বিরুদ্ধ-স্রোত হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। যদিও এই প্রচেষ্টা সীমিত ছিল উচ্চবর্ণের এবং উচ্চশ্রেণির মধ্যে, যা ছিল স্পষ্টতই হিন্দু ও পুরুষপ্রধান।[১৪]

ভারতের চড়ক ও শুশ্রুত, মধ্যপ্রাচ্যের ইবনে সিনা, আল রাজিসহ প্রাচ্যের প্রখ্যাত চিকিৎসক হিসেবে আমরা যাঁদের নাম জানি, তাঁরা ছাড়াও বহু প্রতিভাবান চিকিৎসক প্রাচ্যের বিভিন্ন জনপদে কাজ করেছেন, নানা ধরনের উদ্ভাবন করেছেন। সে যুগে সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান না থাকায় চিকিৎসার চর্চা ও শিক্ষা চলত ব্যক্তিকে ঘিরে। প্রতিভাবান চিকিৎসকরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতানির্ভর নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে হয়ে উঠতেন একেকটি 'প্রতিষ্ঠান'। তাঁদের চর্চার পদ্ধতিগুলো কিছু কিছু লিখিত এবং কিছু কিছু চর্চার মাধ্যমে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত হতো। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর চিকিৎসার ধরনের মধ্যে পাশ্চাত্য ধারার থেকে স্বতন্ত্র অনেক কিছু ছিল। এর মধ্যে সবকিছু না হলেও কিছু কিছু আধুনিক চিকিৎসার মূলধারায় বা স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে আত্মীকৃত হতে পারত; যেমন–আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সামগ্রিক (wholistic) চিকিৎসার ধরন। যেখানে পথ্য, জীবনপ্রণালী, যোগ (ব্যায়াম) এবং অন্যান্য পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে চিকিৎসা দেওয়া হয়, যা আমাদের আধুনিক জ্ঞানের বিচারেও কিছু কিছু রোগ ও শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি হতে পারত।

> পাশ্চাত্যের আধুনিকতা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক যে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতাকে এদেশের ঐতিহ্যগত চিকিৎসার চর্চার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন ছিল তা হলো এর সংশয়ী প্রবণতা। অর্থাৎ প্রচলিত সবকিছুকে প্রশ্ন করা, তার ভিত্তিকে অবিরাম অনুসন্ধান করা এবং ভিত্তিহীন অংশকে বাদ দেওয়া।

আধুনিক ও উন্নত জ্ঞান ও বোধ যেখান থেকেই আসুক তাকে গ্রহণ না করার কথা আমরা বলছি না। কিন্তু পূর্ববর্তী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধারার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা এবং সমন্বয় করা প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আমাদের দেশেও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মর্যাদা রক্ষা, এর ইতিবাচক ও প্রয়োজনীয় অংশকে গ্রহণ করা এবং এর প্রগতিশীলতা অর্থাৎ এর উন্নতির ধারাকে বজায় রাখার জন্য পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে এর যৌক্তিক ও কার্যকর সমন্বয় করা ছিল খুবই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। পাশ্চাত্যে ঐতিহ্যগত (Traditional) চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সমন্বয় হয়েছে দুইভাবে–১) চিকিৎসার মূলনীতির সঙ্গে শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক বিজ্ঞানসমূহের (Basic Sciences) সংযোগ ও সমন্বয় ঘটানো। ২) চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রচলিত ও প্রায়োগিক জ্ঞানকে আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করা। আমাদের দেশে এ ধরনের কোনো সংগঠিত প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। এ কাজটি সঠিকভাবে হতে পারত, যদি ঐতিহ্যগত চিকিৎসার চর্চাকারীদের মধ্য থেকে অনেকে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং তার ভিত্তিমূলে যেসব বিজ্ঞান আছে তা অধ্যয়ন করে দেখতেন। অথবা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত এদেশীয় চিকিৎসকরা যদি দেশীয় পদ্ধতিকে মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করে তারপর এর সমন্বয়ের পরিকল্পনা করতেন। উভয় শাস্ত্রকে ভালোভাবে না জেনে সমন্বয়ের ফল খুব ভালো হবার কথা নয়, তা হয়ওনি।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক ভারতে যাঁরা এই সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউই উভয় শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ছিলেন না। দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে 'আধুনিক', মানসম্মত ও প্রগতিশীল করে তোলার লক্ষ্যেই এই সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ কাজটি করতে গিয়ে 'সমন্বয়বাদীদের' কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ, ঐতিহ্যগত চিকিৎসা 'বিভ্রান্তিকর তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত' (based on erroneous theories) বা 'আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তুল্য নয়'।[১৫] এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হবার পর, সমালোচকদের বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে এর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।[১৬] পরবর্তী দুটি চ্যালেঞ্জ ছিল–দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনা এবং এ ধারার চিকিৎসকদের মর্যাদা ও চিকিৎসার মান বজায় রাখার জন্য রেজিস্ট্রেশন বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা। বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে কলকাতা ও মাদ্রাজে আয়ুর্বেদিক কলেজ স্থাপিত হয়। দুই চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বয় সম্পর্কে মাদ্রাজের স্কুল অব ইন্ডিয়ান মেডিসিনের পরিচালক শ্রীনিবাসন মূর্তি লেখেন–

"যেহেতু চিকিৎসার সকল পদ্ধতির সাধারণ উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অসুস্থতার প্রতিরোধ ও প্রতিকার, চিকিৎসারও কেবল একটি পদ্ধতিই থাকতে পারে। অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি পৃথক পৃথক পদ্ধতি হিসেবে নয়, এই পদ্ধতিরই একেকটি অংশ হিসেবে থাকবে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এগুলো হচ্ছে একই পদ্ধতির মধ্যে চিন্তার বিশেষায়িত একেকটি ধারা।...ভবিষ্যতে আমরা হয়তো দেখব ভারতের চিকিৎসকরা তা সে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি, সিদ্ধা বা ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি–যে ঘরানারই হোক না কেন, তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এমন হবে যে স্বাস্থ্য সমস্যা ও অসুস্থতার বিচার করতে সে শুধু তার পদ্ধতির বিশেষায়িত জ্ঞানকে ব্যবহার করবে তা-ই নয়, বরং যতটা সম্ভব অন্যান্য পদ্ধতিরও প্রয়োগ করবে...এটিই আয়ুর্বেদের মূল আদর্শ...।" [১৭]

আয়ুর্বেদের মূল আদর্শ বোধ হয় এটা নয়, কারণ আয়ুর্বেদের পুনর্জাগরণের অনেক বিশুদ্ধবাদী 'সৈনিক' প্রবলভাবে এই মতের বিরুদ্ধে লিখেছেন।[১৮] তবে সমন্বয়বাদীদের মূলমন্ত্র এমনটা হলে মন্দ হতো না। অনেক সমন্বয়বাদী বিভিন্নভাবে এর পক্ষে লিখতে থাকেন। এঁদের অনেকেই, শুধু বাহ্যিক সমন্বয়ের কথা ভেবেছেন তা নয়। গ্রহণীয় অংশ গ্রহণ করে বর্জনীয় অংশ বাদ দিয়ে দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে একীভূত পদ্ধতি এদেশের বাস্তবতায় অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে– এমনটাও ভেবেছিলেন অনেকে।[১৯] আধুনিক মৌলিক বিজ্ঞানের যেসব শাখার ওপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের যৌক্তিক প্রস্তাবও দিয়েছিলেন অনেকে।[২০] কিন্তু এই সমন্বয়ের চিন্তা সে রকম কোনো বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষার অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং এই পদ্ধতির চিকিৎসকদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি (রেজিস্ট্রেশন)–এ পর্যন্তই সমন্বয়বাদীদের চিন্তা বাস্তবায়নের পর্যায়ে যায়। তবে বিশুদ্ধবাদীদের ও আধুনিকতাবাদীদের 'চরমপন্থার' বিপরীতে সমন্বয়বাদীদের মধ্যপথ ব্রিটিশ শাসনের শেষ বছরগুলোতে সরকারি নীতিকে অনেকটাই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।[২১]

বিশ শতকের প্রথম চার দশকে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির পুনর্জাগরণের আন্দোলনকে সমসাময়িক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল বলে এই আন্দোলনের বড় ধরনের কোনো অর্জন নেই। ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থেকে আত্মপরিচয়ের সংকট, পশ্চিমের বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ থেকে উদ্ভূত গভীর সাংস্কৃতিক সংকট ইত্যাদির মধ্যে পড়ে এই আন্দোলন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসাশাস্ত্রকে এদেশের উপযোগী ইতিবাচক সমন্বয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারেনি। আধুনিকতা, যুক্তিবোধ, প্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে পশ্চিমা ভাবধারায় আচ্ছন্ন হওয়ায় এ সময়ের সংস্কার আন্দোলনগুলো ঐতিহ্যের লিখিত বিষয়গুলোকে আচরিত (কিন্তু লিখিত নয়) বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে। এরা রাষ্ট্র ও আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত অনেক কিছুর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে যতটা সচেষ্ট ছিল, ঐতিহ্যের গভীরে গিয়ে এর ইতিবাচক ও প্রয়োজনীয় অংশকে তুলে আনার ক্ষেত্রে ততটা নয়। ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয় অংশকে চিহ্নিত করা এবং বর্জনীয় অংশকে বাদ দেবার সাহস অর্জন করার জন্য যে স্বাধীন চেতনার প্রয়োজন ছিল, ঔপনিবেশিক আবহে বেড়ে ওঠা পুনর্জাগরণবাদীদের মধ্যে তার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল।

পাশ্চাত্যের আধুনিকতা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক যে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতাকে এদেশের ঐতিহ্যগত চিকিৎসার চর্চার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন ছিল তা হলো এর সংশয়ী প্রবণতা। অর্থাৎ প্রচলিত সবকিছুকে প্রশ্ন করা, তার ভিত্তিকে অবিরাম অনুসন্ধান করা এবং ভিত্তিহীন অংশকে বাদ দেওয়া। প্রচলিত প্রাচীন শাস্ত্রকে স্থির ও অনড় অবস্থায় না রেখে আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক (experimental) ও প্রায়োগিক পদ্ধতির আওতায় এনে একে গতিশীল বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। এ ধরনের 'সমন্বয়' ঐতিহ্যগত চিকিৎসার উল্লেখযোগ্য অংশকে আধুনিক জ্ঞানচর্চার মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে পারত এবং এর বিকশিত হওয়ার পথকে উন্মুক্ত রাখত। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুনর্জাগরণবাদীরা বিষয়টিকে এতটা গভীর থেকে উপলব্ধি করতে পারেননি।

> উপনিবেশিত দেশগুলোতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপনিবেশকারীদের ভাষাই একমাত্র ভাষা হয়ে গেছে। আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষা শেখা ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যাসহ উচ্চতর পর্যায়ের কোনো বিজ্ঞান শেখা যায় না। এর বিপরীতে এশিয়ার দেশ জাপান ও চীনে চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সব শাখার উচ্চপর্যায়ের শিক্ষাও তাদের নিজের ভাষায় গ্রহণ করা সম্ভব।

(৪)

ঐতিহ্যগত চিকিৎসার পুনর্জাগরণের আন্দোলন এবং শহর এলাকার বাইরে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রসার অনেকটা সীমিত হলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা এদেশের চিকিৎসার মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকে প্রযুক্তি ও চিকিৎসার ধরনের দিক থেকে দেশীয় চিকিৎসার সঙ্গে বড় ধরনের পার্থক্য না থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, বিশেষ করে জীবাণুঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে। ফলে পাশ্চাত্য চিকিৎসার গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। উনিশ শতকে এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসার হাতে গোনা হাসপাতাল ছিল। এ সময় সরকারি উদ্যোগেও অনেক হাসপাতাল ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন–মেডিক্যাল স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তরুণ ও মেধাবী তরুণরা অধিক সংখ্যায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা শেখার জন্য আসতে থাকে এসব প্রতিষ্ঠানে। ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে প্রবর্তিত হওয়ায় এদেশের পাশ্চাত্য চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো নির্ভরশীল জ্ঞানে পরিণত হতে থাকে।

বিজ্ঞানের অন্য অনেক শাখার চেয়ে এই ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা বোধ হয় কিছুটা বেশি। অতিরিক্ত নির্ভরতার কিছুটা এসেছে ভাষাগত নির্ভরতা থেকে এবং কিছুটা এসছে প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা থেকে। উপনিবেশিত দেশগুলোতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপনিবেশকারীদের ভাষাই একমাত্র ভাষা হয়ে গেছে। আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষা শেখা ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যাসহ উচ্চতর পর্যায়ের কোনো বিজ্ঞান শেখা যায় না। এর বিপরীতে এশিয়ার দেশ জাপান ও চীনে চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সব শাখার উচ্চপর্যায়ের শিক্ষাও তাদের নিজের ভাষায় গ্রহণ করা সম্ভব।

নির্ভরশীল বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি– ১. উপনিবেশের বিজ্ঞানীগণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চায় পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের যোগ্য না হয়েই পাশ্চাত্যনির্ভর বাহ্যিক বিজ্ঞান-সংস্কৃতির অনুসরণ করতে থাকেন। ২. এই বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণায় তাঁদের নিজের জনগোষ্ঠীর সমস্যার চেয়ে পাশ্চাত্যের সমস্যা প্রাধান্য পেতে থাকে। উপনিবেশোত্তরকালেও আমাদের দেশের পাশ্চাত্য ধারার চিকিৎসা, চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রগুলো অনেকাংশেই এ দুটি লক্ষণে আক্রান্ত। চিকিৎসাবিদ্যার 'সকল জ্ঞান ও নির্দেশনা' পাশ্চাত্য থেকেই আসবে–এমন ধারণাও এদেশে বেশ প্রবল।

ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা প্রচলিত এদেশের সব ধরনের শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জীবন-বিচ্ছিন্নতা। এদেশে শুরু হওয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসার শিক্ষাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। উপনিবেশোত্তরকালে এদেশের মেডিক্যাল শিক্ষাক্রম 'ব্রিটিশ পদ্ধতি' অনুসরণ করেই চলেছে। একুশ শতকের আগে একে আমাদের দেশের উপযোগী করার কথাও কেউ ভাবেননি। পাশ্চাত্যের মেডিক্যাল শিক্ষাক্রম যে ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রবণতা দিয়ে আমাদের আচ্ছন্ন করেছে, সেটাকেও খুব বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি।[২২] ২৮ গত ৫০ বছরে ব্রিটেনসহ পশ্চিমা বিশ্বে মেডিক্যাল শিক্ষাক্রমের কয়েক দফা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাংলাদেশসহ খুব কমসংখ্যক উপনিবেশোত্তর দেশ এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পেরেছে। ব্রিটেনসহ উন্নত দেশগুলোতে ভিত্তিমূলের বিজ্ঞান (Basic Sciences) ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানকে (Applied Sciences) সমন্বিত করে মেডিক্যাল শিক্ষার নতুন পদ্ধতিও (Integrated System) এদেশের আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোনো পর্যায়েই এখনো প্রচলিত হয়নি। আর্থসামাজিক অস্থিরতা, গণতান্ত্রিক কাঠামোর দৈন্য ছাড়াও পরিবর্তন সূচনা করার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের উপনিবেশোত্তর 'জড়তা' ও চিন্তার দৈন্য এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।[২৩] পরবর্তীকালেও শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশই পশ্চিমা ধারা অনুসরণ করে; নিজস্ব প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে নয়।

শিক্ষায় ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার আমাদের যেকোনো পর্যায়ের শিক্ষাকে যতটা ডিগ্রিমুখী করেছে, ততটা জীবনমুখী করেনি। এদেশের মেডিক্যাল শিক্ষাও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনানুযায়ী এর যথার্থ প্রয়োগের শিক্ষা দেয় না। সমাজে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কৃষিবিদ, প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যেমন কৃষিবিদ ও প্রকৌশলীরা বেকার থাকেন, তেমনি সর্বত্র যোগ্য চিকিৎসকের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রচুর চিকিৎসক বেকার থাকেন। এরকম চিত্র শুধু আমাদের দেশেই নয়, উপনিবেশোত্তর এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের অবস্থা কমবেশি এমনটাই।[২৪]

নিজেদের চাহিদা কাজে লাগিয়ে কিভাবে অর্থ উপার্জন ও মানুষের উপকার করা যায়, শিক্ষাক্রম তাদের সে শিক্ষা দেয় না। শিক্ষাক্রম তাদের চাকরিমুখী করে, কর্মমুখী করে না। কাজ করা নয়, এই ধারায় শিক্ষিতদের মূল লক্ষ্য হয় অপেক্ষাকৃত কম জবাবদিহির সরকারি চাকরি অথবা উচ্চমূল্যের বাণিজ্যিক চাকরি। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের এই শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর কৃষিবিদ ও প্রযুক্তিবিদরা যেমন তাঁদের জ্ঞানকে দেশীয় প্রয়োজনে প্রয়োগ করে নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে ভূমিকা রাখতে তেমন কোনো উৎসাহ পান না, বরং চাকরি পাওয়ার আশায় ছুটতে থাকেন, তেমনি নবীন মেডিক্যাল ডাক্তার ছুটতে থাকেন চাকরি এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হবার টার্গেটে। এদেশে নবীন ডাক্তারদের গ্রহণযোগ্য চাকরির প্রধান ক্ষেত্র সরকারি চাকরি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সরকারি চাকরিতে অন্যান্য পদে ঢোকার জন্য যে লিখিত পরীক্ষা হয়, তাতে যে যে বিষয়ের ছাত্র সে বিষয়ের প্রশ্ন থাকে। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে সরকারি চাকরিতে ঢোকার যে লিখিত পরীক্ষা সেখানে ডাক্তারি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে না। অর্থাৎ ডাক্তার হিসেবে সরকারি চাকরি পেতে হলে ভালো 'ডাক্তারি জ্ঞানের প্রয়োজন নেই'!

২০১৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী ইওউ টু (Youyou Tu) চীনের ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় প্রচলিত ভেষজ থেকে ম্যালেরিয়ার আধুনিক চিকিৎসার উদ্ভাবন করেছেন। এরকম উদ্ভাবনেরক্ষমতা ও প্রতিভা নিশ্চয় আমাদের দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের রয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় প্রচলিত ভেষজ নিয়ে এ ধরনের গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি বললেই চলে।

অভাবের কারণে উপনিবেশোত্তর দেশগুলোতে বিজ্ঞানের গবেষণা যতটা কম হবার কথা, বাস্তবে গবেষণা হয় তার তুলনায় অনেক কম। ঐতিহাসিকভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল হবার সীমিত সুযোগের মধ্যে গবেষণাই ছিল সবচেয়ে অবহেলিত অংশ। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে 'পশ্চিম থেকে সব জ্ঞান আসবে'–উপনিবেশোত্তর সমাজে এমন মানসিকতার প্রাধান্য। কোনো সমস্যার সমাধান গবেষণা করে বের করার চেয়ে পাশ্চাত্যের জার্নাল খুঁজে বের করতে আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে যেসব গবেষণা এখানে হচ্ছে, সেখানেও আমাদের দেশের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে খুব কম। আমাদের মেডিক্যাল জার্নালগুলোতে বেশির ভাগ গবেষণা হয় পাশ্চাত্যে সংঘটিত গবেষণার ছায়া অবলম্বনে। অর্থাৎ যে গবেষণা পাশ্চাত্যের কোনো কেন্দ্রে করা হয়েছে, আমাদের বেশির ভাগ গবেষণাই তার চর্বিত-চর্বণ। এদেশের চিকিৎসাব্যয় কিভাবে কমানো যায়, চিকিৎসাসেবার মান কিভাবে বাড়ানো যায়, প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত কিভাবে চিকিৎসাসেবা পৌঁছানো যায়, ওষুধ ও মেডিক্যাল সামগ্রীর উৎপাদন খরচ এবং এসব পণ্যের জন্য আমদানি-নির্ভরতা কিভাবে কমানো যায়–আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় এমন সব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও এসব বিষয়ে গবেষণা খুব কমই হয়েছে।

২০১৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী ইওউ টু (Youyou Tu) চীনের ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় প্রচলিত ভেষজ থেকে ম্যালেরিয়ার আধুনিক চিকিৎসার উদ্ভাবন করেছেন। এরকম উদ্ভাবনেরক্ষমতা ও প্রতিভা নিশ্চয় আমাদের দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের রয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় প্রচলিত ভেষজ নিয়ে এ ধরনের গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি বললেই

চলে। ইওউ টু পাশ্চাত্য চিকিৎসায় শিক্ষিত একজন চিকিৎসক, কিন্তু তাঁর কাজের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র চীনা ভেষজ বিজ্ঞান (Chinese Herbology)। ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় প্রচলিত ভেষজের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা নিরূপণের গবেষণায় যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত একজন চিকিৎসককে নিয়োজিত করতে হবে, তা চীনের মানুষ বুঝলেও আমাদের উপনিবেশোত্তর মানস তা বুঝতে পারেনি। বেইজিং মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী ডা. ইওউ টু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঔষধ রসায়ন (Medicinal chemistry), ক্লিনিক্যাল গবেষণা (Clinical research), ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধ (Antimalarial medication) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কাজ করেছিলেন বলেই ভেষজটি নিয়ে যথার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাঁর পক্ষে করা সহজ হয়েছিল।[২৫]

ঐতিহ্যগত চিকিৎসার ধারা থেকে প্রয়োজনীয় ও অমূল্য অংশ তুলে আনার জন্য আধুনিক জ্ঞান ও ঔপনিবেশিকতামুক্ত মানসিকতা–দুটোরই প্রয়োজন ছিল। ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং আধুনিকতা প্রায় সমার্থক। জ্ঞানের যেসব শাখার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি রয়েছে, সে বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ওই জনগোষ্ঠীতে সামাজিকভাবে অংশ নিতে হবে। জ্ঞানার্জন এখানে সমাজের সঙ্গে নিরন্তর এক মিথস্ক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ওই সমাজের দক্ষতা, জ্ঞান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পরিচিত হয়; ওই জনগোষ্ঠীতে যেকোনো ভূমিকায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।[২৬] চিকিৎসা এরকম একটি পেশা বা বৃত্তি, যেখানে নানাভাবে সমাজে অংশ নিতে হয়, সমাজ ও মানুষের জীবনের গতিপ্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়াকে বিশেষভাবে বুঝতে হয়। ব্রিটিশ শিক্ষাক্রম হুবহু অনুসরণ করার ফলে আমাদের চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষাক্রমে এদেশীয় সমাজকে, এদেশের মানুষের আচরণ, প্রকাশভঙ্গি ও জীবনযাত্রাকে বোঝার জন্য কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি রোগীর অভিযোগ, রোগীর দেওয়া ইতিহাস পর্যালোচনা (Symptomatology) করার যে অংশটি, তা-ও ইংরেজিতে পড়তে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বইগুলো পশ্চিমা লেখক কর্তৃক রচিত। ইংরেজি টেক্স বইয়ে রোগীদের অভিযোগ বা Symptom ইংরেজি ভাষায় দেওয়া আছে। রোগীরা এগুলো বলে বাংলায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। যাঁরা এদেশে ডাক্তারি করবেন তাঁদের জন্য যে বাংলায় আঞ্চলিক ভাষার সংযুক্তিসহ Symptomatology-র বইয়ের দরকার আছে, সেটা ব্রিটিশ পদ্ধতিতে শিক্ষিত কোনো মেডিক্যাল শিক্ষকের মাথায় আসেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি আবেগ নতুন করে জেগে ওঠে। আশির দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ নেন চিকিৎসাবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি। পরে বাংলা একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় এর কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ ডাক্তারি বই সরাসরি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ যে খুবই অপরিণত একটি সিদ্ধান্ত, বইগুলোর ব্যর্থতাই আমাদের তা বলে দেয়। বইগুলো পড়ে কেউ কিছু উদ্ধার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কারণ যাঁরা ওই বিদ্যা জানেন তাঁদের কাছেও এগুলো দুর্বোধ্য বলেই মনে হয়েছে। ঔপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের ব্রিটিশদের হুবহু অনুসরণ করতেই শিখিয়েছে; নতুন করে নিজেদের উপযোগী করে লিখতে শেখায়নি। চীনা ও জাপানিদের সম্পূর্ণ নিজেদের ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। আঠারো শতক থেকেই পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত জাপানিরা অনুবাদের চেয়ে নিজেদের ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসার বই লেখার কাজটিই বেশি করেছেন। চীনেও উনিশ শতক থেকে তাঁরা এ কাজটিই করেছেন। উপনিবেশিত হয়েছিল এমন কোনো দেশে আমরা এ ধরনের উদ্যোগ এখনো দেখি না।

ব্রিটিশ ডাক্তারি বই সরাসরি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ যে খুবই অপরিণত একটি সিদ্ধান্ত, বইগুলোর ব্যর্থতাই আমাদের তা বলে দেয়। বইগুলো পড়ে কেউ কিছু উদ্ধার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কারণ যাঁরা ওই বিদ্যা জানেন তাঁদের কাছেও এগুলো দুর্বোধ্য বলেই মনে হয়েছে। ঔপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের ব্রিটিশদের হুবহু অনুসরণ করতেই শিখিয়েছে; নতুন করে নিজেদের উপযোগী করে লিখতে শেখায়নি।

ইংরেজি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা রোগ সম্পর্কে রোগীদের স্পষ্ট ধারণা দেবার ক্ষেত্রেও বড় বাধা। রোগের নাম, ওষুধের নাম ইংরেজিতে হওয়ায় রোগীদের জন্য তা গ্রহণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ সমস্যার সমাধান যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে একাডেমিক শিক্ষকদের মাধ্যমেই করতে হবে, ব্রিটিশ পদ্ধতির অনুসারী মেডিক্যালের শিক্ষক ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সেই উপলব্ধি নেই। থাকলে উপনিবেশোত্তর গত ষাট বছরে আমাদের দেশে এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও উন্নতি হতো। গত দুই দশকে এদেশে মেডিক্যাল শিক্ষার পদ্ধতিগত উন্নতির জন্য কিছু কিছু মেডিক্যাল শিক্ষক ব্রিটেন থেকে মেডিক্যাল শিক্ষা পদ্ধতির (Medical Teaching Methodology) ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে মেডিক্যাল শিক্ষা পদ্ধতির ওপর কোর্স ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু হয়েছে। মেডিক্যাল শিক্ষায় পদ্ধতিগত যেসব পরিবর্তন তাঁরা করেছেন সেগুলো হচ্ছে শেখা ও তার মূল্যায়নের নতুন কিছু পদ্ধতি; যেমন–Problem-based Learning (PBL), Short Answer Questions, MCQ, OSPE ইত্যাদি। এগুলো সম্প্রতি পাশ্চাত্যে চালু হওয়া কিছু পদ্ধতি, যা শেখার জন্য আগের পদ্ধতির চেয়ে ভালো এবং গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষজ্ঞগণ চিন্তার ঔপনিবেশিক গণ্ডির বাইরে যেতে পারেননি। নতুনতর ব্রিটিশ পদ্ধতি তাঁরা হুবহু প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছেন। কিন্তু আরেকটু এগিয়ে গিয়ে এদেশের প্রয়োজনকে সামনে রেখে শিক্ষাক্রম বা শেখানোর পদ্ধতির দেশীয় ধারা তৈরি করার মতো সৃজনশীলতা দেখাতে পারেননি। ব্যক্তি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এরকম ছোট ছোট কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; যেমন–ক্লিনিক্যাল বিষয়ের সামাজিক চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাক্রম তৈরি।[২৭] এ ধরনের উদ্যোগগুলো এখনো মূলধারায় আসতে পারেনি, সাধারণ কোনো নীতি (Principle) হিসেবেও গৃহীত হয়নি। একুশ শতকে এসেও উপনিবেশের ছায়া এদেশের মেডিক্যাল শিক্ষাকে করে রেখেছে গণ্ডিবদ্ধ ও জীবনবিমুখ।

(৫)

আমাদের সমাজে উপনিবেশের সবচেয়ে বড় ক্ষত ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী এবং আমলাতন্ত্রের সদর্প উপস্থিতি। এই সমাজের সবকিছুর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি। এদেশের চিকিৎসার মান বজায় রাখা এবং একে জনমুখী করার যে

সংকট রয়েছে, তারও অন্যতম প্রধান উৎস এই শাসনপ্রণালী এবং আমলাতন্ত্র। উপনিবেশকারীদের অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য যে শাসনপ্রণালী ও 'অসীম' ক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল, উপনিবেশোত্তরকালে তার টিকে থাকার মূল কারণ অগণতান্ত্রিক শক্তির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যাওয়া। ঔপনিবেশিক আমলের সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত বা পাকিস্তান কোনো দেশেই সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শাসকরা তাদের ক্ষমতা রক্ষার স্বার্থেই ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে সকল ক্ষেত্রের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা চলে যায় এই আমলাতন্ত্রের হাতে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থনৈতিক মন্দা ও যুদ্ধের ব্যাপক বিভীষিকার পর ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে নতুন করে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ধারা শুরু হয়। এ সময়ের আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতির উন্নতির ক্ষেত্রে মানবসম্পদ (human resource) উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে থাকেন। এই লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেবা খাতকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করা হয়। ব্রিটেনে ১৯৪০-এর দশক থেকেই আধুনিক জনস্বাস্থ্যের (public health) ধারণা অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর জীবনপ্রণালী (life style) এবং রোগ ও অসুস্থতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর ব্রিটেন পরিপূর্ণ সেবামূলক রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেটে পরিণত হয়, যেখানে স্বাস্থ্যসেবাকে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর বিপরীতে উপনিবেশগুলোতে সেই পুরনো ব্যবস্থাই চালু থাকে। "উপনিবেশোত্তরকালে গণতান্ত্রিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সবল হয়ে গড়ে না ওঠায় রাষ্ট্রের যেকোনো কার্যক্রমে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রচণ্ড দাপট ও দৌরাত্ম্য বজায় থাকে। স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে অগণতান্ত্রিক শাসকশ্রেণি আমলাতন্ত্রকেই তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অধিক উপযোগী হাতিয়ার বলে গণ্য করেছে। এর ফলে কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগণের সুনির্দিষ্ট চাহিদা বা দাবি অনুযায়ী উন্নয়ন হয়নি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও এ বিষয়টির ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আমরা লক্ষ করিনি।"[২৮]

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করার এক ধরনের উদ্যোগ নেবার চেষ্টা হয় নবগঠিত বাংলাদেশে। সমস্ত পৃথিবীতে এ ধরনের সফল উদ্যোগের দুটি মডেল রয়েছে। একটি সমাজতান্ত্রিক মডেল, অন্যটি পুঁজিবাদী মডেল। প্রথমোক্ত মডেল (সমাজতান্ত্রিক মডেল) অনুযায়ী রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে সবার জন্য সব ধরনের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করবে। এর জন্য রাষ্ট্র কোনো ধরনের অতিরিক্ত কর আরোপ করবে না। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কিউবায় সমাজতান্ত্রিক মডেল জনগণের জন্য সন্তোষজনক স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তুলেছিল। পুঁজিবাদী মডেলটি ছিল ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণাভিত্তিক। এই মডেল অনুযায়ী রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে বা কম মূল্যে (ভর্তুকি দেবার মাধ্যমে) সবার জন্য সব ধরনের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করবে এবং চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ হতে দেবে না। এই ব্যয়ের একটি বড় অংশ আসবে জনগণের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত কর থেকে অথবা স্বাস্থ্যবিমা থেকে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপের অনেকগুলো দেশে এই মডেল সফলভাবে জনগণের জন্য সন্তোষজনক স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তুলতে পেরেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে উপনিবেশোত্তর 'পরনির্ভর' রাজনীতিবিদদের মধ্যে কোনো দূরদৃষ্টি বা স্বপ্ন না থাকায় এই দুটি সফল মডেলের কোনোটিই গ্রহণ করা হয়নি আমাদের দেশে। পরিকল্পনা করা ও তার বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব গিয়ে পড়ল আমলাদের ওপর। এরা 'ওয়েলফেয়ার' মডেলের মতো স্বায়ত্তশাসিত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে না তুলে সমস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত ও কঠোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে।

সত্তরের দশকের প্রথম দিকে এরা দেশের সব চিকিৎসককে সরকারি চাকরিতে ঢোকায়, পরে ১৯৭৯ সালে ইউনিফায়েড ক্যাডার সার্ভিসের নামে সব ডাক্তারকে আমলা বানিয়ে ছাড়ে। সত্তরের দশক পর্যন্ত এদেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল ছিল, বিশেষ করে বিশেষায়িত চিকিৎসা ও হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে। এর কারণ ছিল কয়েকটি– ১. সরকারি হাসপাতালের বাইরে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ছিল কম। ২. শহর অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চাহিদার তুলনায় বর্তমান সময়ের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল। ৩. শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত, এমনকি মধ্যবিত্ত অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এত কম ছিল যে প্রাইভেট চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল।

আশির দশক থেকে কয়েকটি কারণে এদেশে প্রাইভেট চিকিৎসার সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়–

১. উপর্যুপরি সামরিক শাসনের ফলে আশির দশকে এদেশের সামরিক-বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা (ডাক্তারসহ) ও কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অন্যান্য সরকারি বিভাগের মতো স্বাস্থ্য বিভাগেও সেবার মান কমতে থাকে। অন্য অনেক সরকারি অফিসের মতো কাজ আদায় করতে হলে সরকারি হাসপাতালগুলোতেও 'কাজ আদায়ের' জন্য ঘুষ/তদবির ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

২. জনসংখ্যা ও চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য খাতে বাজেট ও জনবল সে হারে না বাড়ানোর ফলে সরকারি হাসপাতালে চাহিদার তুলনায় ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ানের সংখ্যা এবং চিকিৎসার উপকরণ তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে। ফলে এ সকল হাসপাতালে সেবার মান ও পেশাদারিত্বও কমে যায়।

৩. চিকিৎসাক্ষেত্রের অনেক নতুন ও আধুনিক (ব্যয়বহুল) গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি যথাসময়ে সরকারি হাসপাতালে চালু না করা।

আশির দশক থেকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। ২০০৯ সালে এক গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলেও সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নিতে আসছে মাত্র শতকরা ৩৭ ভাগ মানুষ।[২৯] প্রাইভেট চিকিৎসার এই ব্যাপক বিস্তার সরকারি আমলাতান্ত্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে এক অদ্ভুত মিথস্ক্রিয়া তৈরি করে। এটি এমন একটি অদ্ভুত অবস্থা, যেখানে প্রাইভেট চিকিৎসা-ব্যবস্থার অধিকাংশ টেকনিক্যাল জনবল (ডাক্তার, নার্স, থেরাপিস্ট ও টেকনিশিয়ান) সরকারি চাকরি করেন। এঁদের বেশির ভাগ সরকারি পরিচয় ও যোগাযোগকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহার করেন তাঁদের ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসের জন্য। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি দায়িত্ব

> এর একটি চরম রূপ হলো 'দালাল' দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে সরকারি হাসপাতাল থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রের জন্য খদ্দের জোগাড় করা।

পালনে তাঁদের মধ্যে নিষ্ঠা ও পেশাদারীত্বের অভাব দেখা যায় ভীষণভাবে। এর একটি চরম রূপ হলো 'দালাল' দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে সরকারি হাসপাতাল থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রের জন্য খদ্দের জোগাড় করা। শাসকশ্রেণির চরম দুর্বৃত্তায়ন সরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি যতটা নিচে নিয়ে গেছে, তাতে অবস্থা আরও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ এরকম একটি ব্যবস্থার ফলে এখানে নিয়োজিত অর্থ এবং কর্মীদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের ব্যাপক অপচয় ও অপব্যবহার হচ্ছে। এইসব ডাক্তার ও টেকনিশিয়ান সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানেই সার্বক্ষণিক না হওয়ায় তাঁরা সেবার মান ও পেশাদারিত্ব কোনোটাই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বজায় রাখতে পারছেন না। গ্রামাঞ্চলেও যে অধিকাংশ মানুষ আর সরকারি চিকিৎসার দ্বারস্থ হচ্ছে না তার জন্যও দায়ী এই অবস্থা।

শেষ কথা

আমাদের উপনিবেশোত্তর সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং আমাদের মনোজগতে উপনিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীর, সে সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই। ঔপনিবেশিক মানসিকতার উত্তরাধিকার আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আত্মবিশ্বাসকে ব্যাহত করে এবং আমাদের বৃত্তিসমূহকে করে জীবনবিমুখ। উপনিবেশকারীদের মাধ্যমে (আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় নয়) এদেশে আধুনিক চিকিৎসার প্রবর্তন হওয়াটা আমাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থার দুরবস্থা ও দৈন্যের অন্যতম কারণ। আমাদের ঐতিহ্যগত চিকিৎসার আধুনিকায়ন এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে এর কার্যকর সমন্বয় করার অক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে উপনিবেশের উপস্থিতি এবং আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চিকিৎসা ও চিকিৎসাসামগ্রীর বিশাল বাণিজ্যের কারণে এদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এটিও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে আমাদের দুরবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো এবং আমাদের মানসিকতায় উপনিবেশের প্রভাব এই দুরবস্থার আরও বড় কারণ। আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো ও চিন্তাকে বি-উপনিবেশিত করা, এদেশের চিকিৎসাবিদ্যার চর্চাকে জীবনমুখী, সৃজনশীল এবং মানুষের প্রয়োজনের সহায়ক করার সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

মনিরুল ইসলাম: চিকিৎসক ও গবেষক

ইমেইল: monirul852@gmail.com

তথ্যসূত্র

1. David Arnold: Colonizing the Body--State Medicine and Disease in Nineteenth Century India; University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1993 pp 11
2. Wikepedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine
3. World Health Organization: Guidelines On Developing Consumer Informations On Proper Use Of Traditional Complementary And Alternative Medicine; 2004, ISBN 92 4 159170 6
4. Wikepedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Biomedicine The reception of Western Medicine in China
6. Basalla George: The Spread of Western Science, Science 156: 611-22, 1967
7. Izumi Y, Isozumi K: Modern Japanese medical history and the European influence; Keio J Med. 2001 Jun; 50(2): 91-9
8. Jayanta Bhattacharya: Arrival of Western Medicine: Ayurvedic Knowledge of Anatomy and Colonial Confrontation; Indian Journal of History of Science, Vol. 46, No. 1, p. 63, March 2011
9. Ramasuban, Radhika. 1982 Public Health and Medical Research in India: their Origins under the Impact of British Colonial Policy. Stockholm, SAREC, Ramasuban, Radhika. Imperial Health in British India, 1857-1900. In Disease Medicine and Empire: Perspective on Wes tern Medicine and the experience of European Expansion, edited by Roy MacLeod and Milton Lewis. London: Routledge, 1988
10. Marriot, McKim: Western Medicine in a Village of Northern India; In Health Culture and Community: Case Studies of Public Reaction to Health Programs, edited by Benjamin D. Paul: Sage Foundation 1955
11. Uma Ganeshan (University of Cincinnati): Medicine and Modernity The Ayurvedic Revival Movement in India, 1885-1947; Studies on Asia, Series IV, Volume 1, No.1, Fall 2010
12. M M Gananath Sen, Scientific Basis of Ayurveda: An adrerss delivered before South Indian Medical Union, Madras (1923), in Lectures of M M Gananath Sen Saraswati. Varanasi: Chowkhamba Sanskrity Series Office, 2002, 2
13. David Arnold. Science Technology and Medicine in Colonial India. Cambridge University Press, 2000, 179
14. For other articulations of the ayurvedic past, present and future, see Kavita Sivaramakrishnan, "The Use of the Past in a Public Campaign: Ayurvedic Prachar in the Writings of Bhai Mohan Singh Vaid", in Invoking the Past: The Uses of History in South Asia, ed. Daud Ali.New Delhi: Oxford University Press, 1999, 178-191 and Charu Gupta, "Procreation and Pleasure: Writings of a Woman Ayurvedic Practitioner in Colonial North India," Studies in History, vol. 21, no.1, February 2005, 17-44
15. MR Samey, "Hooton Hoots Ayurveda", JAHSM, vol. 4 no .4, October 1927, 121
16. MR Samey, "Hooton Hoots Ayurveda", JAHSM, vol. 4 no. 4, October 1927, 122
17. Murti, "Our aims and Ideals", JAHSM, vol. 1, no. 1, July 1924, 10
18. K.P.Sankara Pillai. " Ayurveda and Some Western Medical Sciences", JAHSM, vol. 10, no. 4, October 1933, 221
19. "Scientific and Practical Medicine", JAHSM, 4(12), June 1928, 444
20. Charles Leslie. "The Professionalization of Ayurvedic and Unani Medicine", Transactions of the New York Academy of Sciences, Ser. II, 30 (4) (February, 1968), 559-572
21. Kopf. British Orientalism, Jones. Arya Dharm Lelyvel Aligarh's First Generation Metcalf Islamic Revival in British India Oberoi The Construction of Religious Boundaries
22. Bleakley A1, Brice J, Bligh J. Thinking the post-colonial in medical education; Med Educ.2008 Mar; 42(3):266-70. doi: 10.1111/j.1365-2923.2007.02991.x
23. Gukas ID: Global Paradigm Shift In Medical Education: Issues Of Concern For Africa; Med Teach. 2007 Nov; 29(9): 887-92
24. LucasWandela, Eugenia,"Tanzania Post-Colonial Educational System And Perspectives On Secondary Science Education, Paedagogy And Curriculum: A Qualitative Study" (2014). College Of Education, Theses And Dissertations Paper 71
25. Wikepedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Tu_Youyou
26. Edward Shizha (Faculty of Extension, University of Alberta): Legitimizing indigenous knowledge in Zimbabwe: A theoretical analysis of postcolonial school knowledge and its colonial legacy, Youth and Children's Studies, Laurier Brantford, 2006
27. Khan AK, Hussain AZMI : Development of community based curriculum on ophthalmology for under graduate medical course in Bangladesh; Bangladesh Medical Research Council Bulletin 2012; 38: 51-58
28. মনিরুল ইসলাম : স্বাস্থ্য পরিষেবায় 'অভাবনীয় উন্নতি' এবং জনসাধারণের প্রাপ্তি : সংস্কৃতি, মে ২০১৫ সংখ্যা
29. Mohammad Shafiqul Islam and Mohammad Woli Ullah: People's Participation in Health Services: A Study of Bangladesh's Rural Health Complex; Bangladesh Development Research Center (BDRC) for the overall Working Paper Series, 2009